লীলা মধুরা

জননীরূপে বিবেকানন্দ

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেজোদীপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পুরুষসিংহ। তাঁর সিংহবৎ প্রতিটি পদক্ষেপে মহাশক্তির স্ফুরণ দেখা যেত। মুখমণ্ডলে সর্বদা এক অপূর্ব ভাব শোভা পেত, আবার কখনও কখনও মুখখানি তেজে অগ্নিবর্ণ হয়ে থাকত। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটি ছিল অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু সেই চোখের দিকে তাকানো সহজ ছিল না। স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করে কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ) বলেছিলেন, ''তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। কি অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা nonchalant ভাব, a dazzling personality! আমার first impression—ভালবাসা; ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব।''[১] আবার তাঁকে দেখে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ : ''দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্মের নেপোলিয়ান। দেখলাম, সন্ন্যাসীর গৈরিকের অন্তরালে দুলে উঠছে যোদ্ধার বুক। আলেকজান্ডার, সীজার যে ধাতুতে গড়া সেই একই ধাতু—কেবল ভূমিকা ভিন্ন।''[২] ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার বা গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গ উঠে এলেও গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু কিন্তু বলেছেন, ''বিবেকানন্দ সীজার নন, আলেকজান্ডার নন, নেপোলিয়ান নন—তিনি তাঁদের অনধিগম্য কোনো মহারাজ্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাট। বিবেকানন্দ বিবেকানন্দই।''[৩]

খাঁটি কথা, বিবেকানন্দের তুলনা বিবেকানন্দের সঙ্গেই সঙ্গত। কারণ তিনি আসলে কী, তা আর একজন বিবেকানন্দের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। অজস্র উদাহরণ দিয়েও সঠিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দের পুরুষকারকে যেমন বোঝানো যাবে না, তেমনই তাঁর জননীসুলভ হৃদয়বত্তার কথাও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তিনি কখনও পিতা, কখনও ভাই, বন্ধু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আবার অনেকসময়ই তিনি মা হয়ে উঠতেন। স্নেহ-মায়া-মমতাময়ী জননী যেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবের মাতৃভাবের কথা আমাদের জানা। তাঁর সন্ন্যাসী পার্ষদদের জীবনেও অনেকসময়েই মাতৃভাবের প্রাবল্য দেখা গেছে। স্বামীজীর মাতৃময়তাও আমাদের মুগ্ধ করে। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ পুরুষ বলে প্রসিদ্ধ এই মানুষটির মন এত

শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আই টি আই, আসানসোল

নরম ছিল যে, অন্যের জন্য প্রায়ই তিনি কাঁদতেন। দু-চোখ ছাপিয়ে যেত জলধারা। কখনও দীর্ঘ সময় ধরে চলত অস্থির পদচারণা। অন্যের কষ্ট দেখে বা শুনে তাঁর মনের ভেতর এমনই তোলপাড় হত।

সিস্টার ক্রিস্টিনকে বিস্মিত করেছিল স্বামীজীর মনের সৌন্দর্য। তিনি বলেছেন, ''কি আশ্চর্য মননশীলতা! কি অভাবনীয় সব চিন্তা! এমন কোনও শব্দ আমার জানা নেই যা দিয়ে তাঁর সেই মনের ব্যাপ্তি, দীপ্তি বা অলোকসামান্যতার সামান্যতম আভাসও দিতে পারি! অন্যেও কি তা পারেন? পারেন না। কারণ, তাঁর মন আর পাঁচজনের, এমনকি যাঁরা প্রতিভাবান বলে সুখ্যাত, তাঁদের সকলের মনের চেয়েও এতটাই উচ্চভূমিতে বিরাজ করত যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠনটিই ছিল একেবারে আলাদা। সেই অনন্য মনের চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট, এত বলিষ্ঠ এবং এতটাই অতীন্দ্রিয় যে তা কোনও স্থূলদেহীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না।''[৪] অত্যুচ্চভূমিতে বিরাজিত সেই মন থেকে উৎসারিত স্বামীজীর মাতৃভাব কেমন ছিল তা খোঁজার চেষ্টা করব।

বাড়িতে অসময়ে অতিথি বা ভিখারি এলে মায়েরা সাধারণত যেমন নিজের খাবারের সিংহভাগ তাকে তুলে দেন, তেমনই ছিলেন স্বামীজী। অনেকটা নয়, তিনি তুলে দিতেন সবটাই। স্বামী বিমলানন্দের স্মৃতি থেকে জানা যায় : বরাহনগর মঠে থাকার সময় স্বামীজী একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুভাইয়েরা ভিক্ষা করে কিছু টাকা জোগাড় করে বায়ুপরিবর্তনের জন্য স্বামীজীকে শিমুলতলায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে একদিন দুপুরে স্বামীজী খেতে বসবেন, দেখেন কয়েকজন ভিখারি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। জানা গেল, তারা খুবই ক্ষুধার্ত, ভাতের ফেনের জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী নিজের খাবার তাদের খাইয়ে দিলেন। বুভুক্ষুদের ক্ষুধার যন্ত্রণা তাঁর কাছে এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, রোজ ওদের ক্ষুধা নিবারণের ক্ষমতা তাঁর নেই বুঝতে পেরে ব্যথাতুর হৃদয়ে তিনি শিমুলতলা থেকে ফিরে এসেছিলেন।[৫] রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কেদারবাবা বলে পরিচিত কেদারনাথ মৌলিক—পরবর্তী কালে স্বামী অচলানন্দ—বলতেন, ''স্বামীজীর ভালবাসার কথা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না—আমার সে শক্তি নাই। এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন প্রেমের প্রতিমূর্তি।''[৬] বেলুড় মঠে কেদারবাবা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজী সেইসময় তাঁর জন্য ফল ও অন্যান্য পথ্য পাঠিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে, নিজে খেতে বসেছেন, মনে পড়ে গেছে কেদারবাবা অসুস্থ, তখনই সেই খাবারের থালা সেবকের মারফত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।[৭]

অসুস্থ হয়ে স্বামীজী বায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন কাশীতে ছিলেন। সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাকর্মীরা নিজেদের কাজ সেরে প্রায় প্রতিদিনই পাঁচ মাইল দূরের বাড়িতে গিয়ে স্বামীজীকে দর্শন করতেন, তাঁর কথা শুনতেন। কখনও কখনও তাঁরা সেখানেই রাতের খাবার খেতেন। স্বামীজী সকলের সঙ্গে খেতে বসতেন। খেতে খেতে যে-রান্নাটি তাঁর মুখে ভাল লাগত সেটি তিনি পাত থেকে তুলে সবাইকে ভাগ করে দিতেন আর জননীর মতো বলতেন, ''কি রে ভালো লাগছে? খা, খা বাবা, বেশ করে খা। আমার ভালো লাগলো, তাই তোদের দিলুম।''

স্বেচ্ছাকর্মীদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল অত্যন্ত রোগা এবং অসুস্থ। স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, ''বাবা, তোমাকে কাজ করতে হবে, কিন্তু তুমি দেখছি, বড় দুর্বল। তোমার ভালো খাওয়া দরকার। তুমি দুবেলা এখানে এসে আমার সঙ্গে খাবে; আর তা যদি না পারো, অন্তত দুপুরবেলা এখানে আমার সঙ্গে খেও।'' সেবাশ্রমের কাজের চাপে ছেলেটির দুপুরবেলা আসতে দেরি হয়ে যেত। এদিকে স্বামীজী তখন ডায়াবেটিসে ভুগছেন, ডাক্তার ও

গুরুভাইরা তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছেন। সময়ের যাতে একটুও নড়চড় না হয়, সকলের সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু স্বামীজী ছেলেটির প্রতি জননীসুলভ স্নেহে নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে যেতেন। তার জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতেন। অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতেন। রাস্তার দিকে, দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কাউকে দেখতে পেলেই জিজ্ঞাসা করতেন, ''ছেলেটি কি এলো? আজ এত দেরি কচ্চে কেন? আহা বেচারী! একে দুর্বল শরীর, তায় আবার এত বেলা পর্যন্ত কিছুই খায়নি। কতই বা বয়স! তার ওপর এই খাটুনি!''

ছেলেটি যখন ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকত, তখন স্বামীজীর মুখের চেহারাই পালটে যেত। বহুদিন পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলে, ছেলেকে কাছে পেয়ে মায়ের যেরকম মুখের ভাব হয়, সেইরকম তৃপ্তিতে আনন্দে স্বামীজীর মুখখানি জ্বলজ্বল করত। জিজ্ঞাসা করতেন, ''হ্যাঁরে, এত দেরি হলো কেন? জানি, আজ তোর বড্ড কাজের চাপ ছিল। তা, হ্যাঁ রে, সকালে কিছু খেয়েছিলি তো? দ্যাখ, তোর জন্যে এখনো আমি না খেয়ে বসে আছি। আয় বাবা, চটপট হাত-পা ধুয়ে নে, আমরা খেতে যাই।'' তাকে নিয়ে স্বামীজী অন্যদের সঙ্গে খেতে বসতেন। খাওয়ার সময় সর্বদা ছেলেটির প্রতি নজর রাখতেন আর যখনই ভাল বা সুস্বাদু কিছু তাঁর থালায় দেওয়া হত, সেটি তিনি নিজের থালা থেকে তুলে তার পাতে চালান করে দিতেন। স্বামীজী নিজের খাওয়া ভুলে পরম স্নেহে ছেলেটিকে খাওয়াতেন ও তার খাওয়া দেখতেন।[৮]

মায়েরা খেয়ে নয়, খাইয়েই আনন্দ পান। স্বামীজীর স্বভাবও ছিল তেমনই। পরিচিত জনদের তো বটেই, অপরিচিতদেরও তিনি খাওয়ানোর সুযোগ পেলে অপার আনন্দিত হতেন। স্বামীজী তাঁর মাকে পূর্ববঙ্গ ও আসামে তীর্থ করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পদ্মানদীপথে গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় দেখেন জেলেরা ইলিশ মাছ ধরছে। সেবক নির্ভয়ানন্দকে তিনি বললেন, ''বেশ তাজা ইলিশ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।'' সেবক বুঝলেন, স্টিমারের গরিব মুসলমান খালাসিদের স্বামীজী খাওয়াতে চান। নদীবক্ষে ইলিশের দর ছিল এক আনায় একটা। তিন-চারটি মাছ হলেই হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীজীর নির্দেশে এক টাকার ইলিশ কেনা হল। পথে স্টিমার থামিয়ে চাল এবং পুঁইশাক জোগাড় করে সকলকে ভূরিভোজ করিয়ে তবে স্বামীজী তৃপ্তি পেলেন।[৯]

স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়বত্তার অনেক ঘটনা তাঁর জীবনীকারেরা উল্লেখ করেছেন। কয়েকটির উল্লেখ করতেই হয়। একসময় স্বামীজী মীরাটে এক ডাক্তারের বাড়িতে কয়েক মাস ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ছ-সাত জন গুরুভাই। একদিন স্বামীজী সেখানে পোলাও রান্না করেন। দারুণ সুস্বাদু হয়েছিল সেটি। 'ভাল হয়েছে' বলায় সমস্তই গুরুভাইদের খাইয়ে দিলেন, নিজে একটুও দাঁতে কাটলেন না। বললেন, ''আমি ওসব ঢের খেয়েছি —তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ হচ্ছে, সব খেয়ে ফেলো।''[১০] আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে থাকার সময়ও স্বামীজী কোনও কোনওদিন রান্না করে সকলকে খাওয়াতেন। তাঁর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

ভালবেসে উপহার দিতেও তিনি খুব পছন্দ করতেন। অনেকবার দেখা গেছে গুরুভাই, শিষ্য বা ভক্তদের তিনি কিছু না কিছু উপহার দিচ্ছেন। একবার এক অল্প চেনা ছাত্রের হাতে সোনার চেন দেওয়া ঘড়িটি তুলে দিয়েছিলেন।

সব মানুষই ছিল যেন তাঁর সন্তানতুল্য। মানুষের দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বারবার এমন ঘটনা দেখা গেছে। স্বামী বিমলানন্দ জানাচ্ছেন : একবার কলকাতায় কোনও কাজে

তিনি অন্যত্র যাচ্ছিলেন। তাঁর পকেটে ছিল এক আনা মাত্র। যখন ট্রামে উঠতে যাবেন তখন এক ভিখারি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। স্বামীজী ওই এক আনা তাকে দিয়ে সমস্ত পথ হেঁটেই গেলেন।[১১]

দার্জিলিঙে অবস্থানকালে প্রাত্যহিক ভ্রমণে বের হয়ে স্বামীজী একদিন দেখেন, এক ভুটিয়া মেয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে। হঠাৎ পায়ে হোঁচট লাগায় পিঠের বোঝা নিয়ে সে পড়ে যায়, তার পাঁজরে ভীষণ আঘাত লাগে। স্বামীজী অনিমেষ নয়নে সে-দৃশ্য দেখে খুবই বিমর্ষ হন। তারপর তিনি নিজের পাঁজরে এতই ব্যথা অনুভব করলেন যে, আর চলতেই পারছিলেন না। সঙ্গীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''স্বামীজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?'' তিনি নিজের পার্শ্বদেশ দেখিয়ে বললেন, ''এইখানে—দেখিসনি ওই স্ত্রীলোকটির লেগেছে।'' সঙ্গীরা সেদিন স্বামীজীর সেই কথার তাৎপর্য বোঝেননি। পরবর্তী কালে বুঝেছিলেন যে, স্বামীজী সেই মানুষ, যিনি অন্যের ব্যথা নিজ দেহে অনুভব করতে সক্ষম।[১২] ঠিক যেমন, গঙ্গার উপর নৌকায় এক মাঝি অন্যের পিঠে চড় মারলে তীরে বসে থাকা রামকৃষ্ণদেবের পিঠ আরক্ত হয়ে ফুলে উঠেছিল। যেন তাঁর পিঠেই পড়েছে চপেটাঘাত! যন্ত্রণায় তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। এখানেও এই অচেনা ভুটিয়া মেয়ের আঘাত স্বামীজীকে আহত করেছিল। সন্তান আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে মা যেমন কষ্ট পান, এ যেন তেমনই।

মা দোষ দেখেন না—তাঁর কাছে সৎ-অসৎ সকল সন্তানই সমান স্নেহের। যথার্থ মায়ের মতোই স্বামীজী বলেছিলেন, ''যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।''[১৩] স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছেন, '' 'মহাপাপীকে ঘৃণা করো না' এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে।''[১৪]

একবার ট্রেনে যাত্রা করার সময় এক স্টেশনে স্বামীজী দেখেন এক ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রি করছে। সেবককে তিনি বললেন, ''ছোলাসিদ্ধ খেলে বেশ হয়। বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস।'' সেবক স্বামীজীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এক পয়সার ছোলাসিদ্ধ কিনে ফেরিওয়ালাকে চার আনা দিলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ''কিরে কত দিলি?'' চার আনা শুনে বললেন, ''ওরে ওতে ওর কি হবে? দে, একটা টাকা দিয়ে দে। ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে।''[১৫] অচেনা-অজানা মানুষজনের প্রতি তাঁর এই মনোভাব সবসময়ই বজায় থাকত। এতে মায়ের মতোই অসামান্য স্নেহ-ভালবাসা আর পরদুঃখকাতরতা মিশে থাকত।

গুরুভাইদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে যেমন মাতৃত্ব ফুটে উঠত, তেমনই শিষ্যদের কাছেও তিনি ছিলেন মা। যেমন দেখা গেছে শরৎচন্দ্র গুপ্তের ক্ষেত্রে। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বামীজী তাঁর নাম দিলেন সদানন্দ। একবার তাঁর সঙ্গে স্বামীজী চলেছেন হৃষীকেশের পার্বত্য বন্ধুর পথে। লোটা-কম্বলের পুঁটলি নিয়ে সদানন্দের পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে, অথচ স্বামীজী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। সদানন্দ ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। মাথায় ভারি বোঝা, ভারি জুতো আর পাহাড়ি পথের অনভ্যাসে তিনি বেসামাল। বুট জোড়া যেন ক্রমশ আরও ভারি হয়ে উঠছে। সদানন্দ তাই জুতো খুলে পুঁটলির মধ্যে ভরে নিলেন। তবু অবসন্ন শরীরে উঁচু-নিচু, পিচ্ছিল পথ চলতে গিয়ে একসময় এমন অবস্থা হল যে, তিনি আর ভারসাম্য রাখতে পারছিলেন না। শিষ্যের এই দুরবস্থা দেখে স্বামীজীর মাতৃহৃদয় জেগে উঠল। জুতো সমেত ''পুঁটলিটি কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং দৃঢ়

হস্ত প্রসারিত করিয়া শিষ্যের দেহটিকেও সবলে ধরিয়া লইয়া পথ চলিতে থাকিলেন।"[১৬] মনে পড়ে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শেয়ালে বা কুকুরে নিয়ে যাওয়া লাটুর জুতো খুঁজে বেড়িয়েছিলেন বাগানময়। আর স্বামীজী সন্তানসম শিষ্যের জুতো মাথায় তুলে নিয়েছেন! এই ভালবাসার জন্ম মাতৃভাব থেকেই হয়। ঠাকুরের মাতৃভাবের কথা সর্বজনবিদিত। আর শ্রীশ্রীমা তো পৃথিবীর সমস্ত মায়ের ভালবাসার যোগফল। স্বামীজীর মাতৃহৃদয় থেকে উৎসারিত ভালবাসাও কিছু কম নয়। দিব্যত্রয়ীর এই নির্বিচার নিঃস্বার্থ ভালবাসাই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের মূল সুর হয়ে আছে।

স্বামীজীর শিষ্যবাৎসল্য, যা সুগভীর হৃদয়বত্তার পরিচায়ক, সেইসব স্মৃতিচিত্র অনুপম। স্বামী সদানন্দের লেখনীতে : ''একদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এতো কাতর হয়েছিলাম যে, সেদিন নিশ্চিতই আমার মৃত্যু হত। কিন্তু স্বামিজীর কি স্নেহ! তিনি নিজ হাতে আমায় ধরে ধরে কতদূর নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আর একদিন একটি পার্বত্য নদী পার হয়ে যেতে হবে। একজনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া যোগাড় করা গেল। নদীতে দারুণ বেগ—আবার স্রোতের তলায় ভয়ংকর পিছল পাথর আর নুড়ি। পা পিছলাবার আশঙ্কা পদে পদে। আর ঐ খরস্রোতের মধ্যে এক পা পিছলালেই মৃত্যু অবধারিত। আমি তো দিব্যি ঘোড়ায় চড়ে চলেছি—আর স্বামিজী নিজের জীবন বিপন্ন করে, সহিসের মতো আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে, ঘোড়াকে আর আমাকে সামলিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে এমন কয়েকবার মনে হয়েছিল যে, ঘোড়াকে বুঝি আর রাখা যাবে না। কিন্তু অসমসাহসী ছিলেন স্বামিজী,—কত প্রেম আর করুণা ছিল তাঁর বক্ষে! নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, ঘোড়াশুদ্ধ আমাকে পার করেছিলেন। তাঁর প্রেম ভালবাসার কথা কি মুখে বলা যায়? তিনি প্রেমেরই অবতার ছিলেন।... তাঁর সঙ্গে থাকলে মনে এতটা বল ও সাহস থাকত যে মৃত্যুকেও তুচ্ছ বোধ হত। একদিন পাহাড়ে এক জঙ্গলের পথে চলেছি, যেতে যেতে এক জায়গায় কিছু মানুষের অস্থি পড়ে আছে দেখা গেল—আশে পাশে আবার টুকরো টুকরো গেরুয়া কাপড়ও পড়েছিল। স্বামীজী সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখ সদানন্দ, একজন সন্ন্যাসীকে বাঘে খেয়েছে। তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আপনি সঙ্গে থাকলে কিসের ভয় আমার?' "[১৭] সত্যিই তো, মা সঙ্গে থাকলে সন্তানের কিসের ভয়?

কেদারবাবা বলেছিলেন, ''স্বামিজী মহারাজের আমাদের প্রতি যে কী গভীর ভালবাসা ছিল—তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়। আমার পক্ষে তাহার গভীরতার পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।... তাহা মুখে বা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কেবল অনুভব করা যাইতে পারে।" স্বামীজীর শিষ্যবাৎসল্য প্রসঙ্গে কেদারবাবা বলেছিলেন, ''একটি ঘটনার দ্বারা তাঁহার ভালবাসার উদাহরণ দিতেছি। একবার কানাই মহারাজ (নির্ভয়ানন্দ) তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে স্বামীজী অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে শান্ত হইয়া শুইয়া থাকেন। পরে কানাই মহারাজ আপনা হইতে নিদ্রোত্থিত হইলে, তবে তিনি উঠিলেন।"[১৮] মা যেমন ঘুমন্ত শিশুর পাশ থেকে উঠে যেতে পারেন না, একটু নড়লেই পাছে সন্তানের ঘুম ভেঙে যায়, এ যেন ঠিক সেইরকম।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের, শিষ্যদের, সেবকদের পিতার মতো অভয় দিতেন আর মায়ের মতো আগলে রাখতেন। আবার জগতের সকলের প্রতিই ছিল তাঁর মাতৃভাব, অর্থাৎ সকল নারীপুরুষের প্রতি

সন্তানদৃষ্টি ছিল। শিশুদের সঙ্গেও স্বামীজী অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। বলা বাহুল্য, মাতৃস্নেহ অবলম্বন করেই তিনি তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তাঁর স্নেহ-ভালবাসা বুঝতে শিশুদের অসুবিধা হত না। ফলে দেশে-বিদেশে সর্বত্রই অনেকবার দেখা গেছে, ছোটরা সহজেই তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ১৮৯৩ সাল। স্বামীজী তখন শিকাগো শহরে মিস্টার হেলের বাড়িতে অবস্থান করছেন। সামনের লিঙ্কন পার্কে স্বামীজী প্রতিদিন বেড়াতে ও রোদ পোহাতে যেতেন। ওই সময় পার্কের মধ্য দিয়ে এক মহিলা তাঁর ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে বাজার করতে যেতেন। মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর বাজার করতে অসুবিধা হয়, এদিকে এক ভদ্রলোক প্রতিদিন পার্কে বসে থাকেন দেখে মহিলাটি একদিন ভদ্রলোকটিকে (স্বামীজীকে) জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কিছুক্ষণ তাঁর মেয়ের ভার নিতে পারবেন কী না। স্বামীজী সহজেই রাজি হলে, তিনি শিশুকন্যাকে স্বামীজীর হাতে সঁপে দিয়ে বাজার করতে চলে যান। এরপর থেকে এই ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল।[১৯] এ থেকে মনে করা যেতেই পারে, স্বামীজী শিশুটির সঙ্গে শিশু হয়ে দিনের পর দিন তাকে আনন্দ দিতেন এবং নিজেও আনন্দে সময় কাটাতেন। আসলে সকলকে সন্তানের দৃষ্টিতে গ্রহণ করার বিরল শক্তি থাকায় শিশুদের কাছে তিনি সহজেই গ্রহণীয় ছিলেন। স্নেহ-ভালবাসা এবং হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে তিনি বুঝি তাদের দ্বিতীয় মা হয়ে উঠতেন।

পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কথিত একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বামী চেতনানন্দজী। ''পরিব্রাজক স্বামীজী যখন পশ্চিম ভারতে পর্যটন করছিলেন তখন তিনি মহাবালেশ্বরে এক উকিলের বাড়িতে অতিথি হন। ঐ উকিলের এক শিশুকন্যা ছিল। সে রাতে এত কাঁদত যে কাউকে ঘুমাতে দিত না। একদিন স্বামীজী ঐ শিশুর বাপ-মাকে বললেন, 'আপনারা যদি শিশুটিকে আমাকে দেন, তাহলে আজ রাতে আমিই ওকে সামলাব।' মা বললেন, 'স্বামীজী, আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি এর কান্না থামাবেন কি করে? আমিই এই বাচ্চাটির কান্না থামাতে পারছি না, আপনি কি করে সামলাবেন?' স্বামীজী বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে।' শিশুটিকে স্বামীজীর কাছে দেওয়া হলে তিনি উহাকে কোলে রেখে ধ্যান শুরু করলেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, শিশুটি সারারাত একবারও কাঁদল না—চুপ করে ঘুমাল।''[২০] কী বলা যাবে একে? স্নেহের স্পর্শগুণ? নাকি ভালবাসার জাদুর ছোঁয়া? কিন্তু তা কি শিশুটির মায়ের ছিল না? তাহলে! স্বামীজী কি মায়ের চেয়েও বেশি? কখনও

কখনও হয়তো তাই।

একদিন মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় স্বামীজী দেখেন জেলেদের কয়েকটি শিশু কোমর পর্যন্ত জলে নেমে মায়েদের মাছ ধরার কাজে সাহায্য করছে। মায়েরা এতে অভ্যস্ত। নগ্নদেহ শিশুগুলির হাড় জিরজিরে চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল অধিকাংশ দিনই এরা অনাহারে থাকে। স্বামীজীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। তিনি মমতাভরা সুরে বলে উঠলেন, ''হে ভগবান, এই হতভাগাদের সৃষ্টি করলে কেন? আমি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না। হে ভগবান, আর কতদিন এ চলবে, কতদিন?''

একবার শিবরাত্রির সময় এক বালক অন্যের দেখাদেখি নির্জলা উপবাস করেছিল। নিতান্তই অল্প বয়স, উপবাসের অভ্যাস নেই। ফলে দুপুরবেলা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে খুবই কাতর হয়ে পড়ে। স্বামীজী তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে উপবাস করেছে কী না। উত্তর শুনে ক্ষুধার্ত সন্তানের প্রতি মায়ের দরদ যেন উপচে পড়ল। খেয়েও শিবরাত্রির 'ফল' পাওয়া যায় বলে বালকটিকে ভুলিয়ে তিনি নিজের থালা থেকে তার হাতে ফলমিষ্টি তুলে দিয়েছিলেন।[২১]

জন হেনরি রাইট—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক—স্বামীজীর শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিতির পশ্চাতে বাহ্যত যাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর তিনটি সন্তান ছিল। বড়টি মেয়ে—এলিজাবেথ বা বেসি, তারপর দুই ছেলে—অস্টিন এবং জকি বা জন। স্বামীজী যখন প্রথম এদের দেখেন তখন তাদের বয়স যথাক্রমে তেরো, দশ ও দুই। স্বামীজী তাদের সঙ্গে যেন শিশু হয়ে খেলাধূলা করতেন, মজা করতেন। দুর্ভাগ্যবশত অল্প বয়সেই বেসির মৃত্যু হয়। স্বামীজী লন্ডনে থাকাকালীন সেই সংবাদ পেয়ে সন্তানবিয়োগের মতো দুঃখ পেয়েছিলেন।[২২]

জর্জ ডব্লিউ হেল এবং তাঁর পত্নী ধর্মসম্মেলনের আগে স্বামীজীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ক্রমশ এঁরা স্বামীজীকে আপনার জন ভেবে ভালবেসেছিলেন। এই পরিবারের সকলের সঙ্গে স্বামীজীর গভীর আত্মীয়তা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে প্রচার সেরে ভারতে ফেরার আগে হেল পরিবারের কাছে স্বামীজী কয়েকদিন ছিলেন। দেশে ফিরে আসার আগের রাতে স্বামীজী সারারাত ঘুমোতে পারেননি। পরদিন সকালে অতি মৃদুস্বরে বলেছিলেন, ''ওঃ মানুষের ভালবাসার বাঁধন কাটানো কতই না কঠিন!''[২৩] তিনি জানতেন, হেল ও ম্যাককিন্ডলি বোনেদের সঙ্গে এ-ই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। এঁদের সঙ্গে তাঁর ভাইবোনের মতো সম্পর্ক। সেই স্নেহের বাঁধন ছিন্ন হবে ভেবে মাতৃসম তাঁর কোমল হৃদয় অত্যন্ত অস্থির ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। ছোটদের প্রতি তিনি কতটা যত্নশীল ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন তার উদাহরণ পাওয়া যায় 'Vedanta Kesari' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৩৮ সংখ্যায়। ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ স্বামীজী স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেওঘরে যান। সেইসময় একদিন পথে নিচু হয়ে বসে এক স্কুলছাত্রের জুতোর ফিতে বেঁধে দেন। এইরকম অনেক ঘটনায় জননীরূপে স্বামীজীকে দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার এক স্ত্রীভক্তের প্রতি কোনও কারণে বিরূপ হয়েছিলেন এবং অন্য ভক্তদেরও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বারণ করেছিলেন। ভক্তটি দুঃখে ও অনুতাপে মর্মাহত। স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) তা শুনে এক গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। আবদার করে তাঁর কাছে খাবার খেলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে ঠাকুরকে সব বলাতে ঠাকুর বললেন, ''সেকি রে? আমি বারণ করলুম, আর তুই গিয়ে খেয়ে এলি?'' নরেন্দ্র বললেন, ''খাব না? তাঁকে এখানে আসতেও বলে এসেছি।''[২৪] প্রিয়শিষ্যের উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ

খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

রামকৃষ্ণদেব বারবনিতাদেরও মা বলে ডেকেছেন। একবার এক বারাঙ্গনাকে তামাক খেতে দেখে জগজ্জননীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ''মা, তুই এখানে এই রূপে রয়েছিস?'' তাঁরই যোগ্য শিষ্য স্বামীজী কায়রোর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একবার পৌঁছে যান রূপজীবিনীদের অঞ্চলে। একদল মেয়ে যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে তাঁকে ডাকতে লাগল, স্বামীজী বলেছিলেন, ''আহা, দুঃখিনী বাছারা! এরা দৈহিক সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবত্বকে বলি দিয়েছে।''[২৫] তাদের জন্য তিনি সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়েই কেঁদেছিলেন। তারা এইরকম মানুষ প্রথম দেখল, যে তাদের দুঃখে কাঁদে। স্বামীজীর কাছে এসে তারাও কেউ কেউ কাঁদল, কেউ লজ্জায় মুখ ঢাকল, কেউ আবার পালিয়ে বাঁচল, কেউ বুঝল ইনি ঈশ্বরজানিত পুরুষ।

স্বামীজী নিজের প্রকৃতি জেনেছিলেন। বহির্জগতে তিনি পুরুষসিংহ, কিন্তু অন্তর্লোকে? নিজেকে উন্মোচিত করে বিবেকানন্দ লিখেছেন, ''আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়ে-গুণ বেশী।... আমি সব সময়েই অন্যের দুঃখবেদনা শুধু শুধু নিজের উপর টেনে নিই... ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হলে একটা বেড়াল পুষে তার উপর ভালবাসা ঢেলে দেয়।''[২৬] ১৮৯০ সালের ৩ মার্চ, গাজীপুর থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন, ''কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুকুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি।''[২৭] আসলে তাঁর কাছে কেউ পর নয়, সবাই আপনার। যেন আপন পুত্রকন্যা, ভাইবোন। মি. জে জে গুডউইন ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য ও বহু বক্তৃতার লিপিকার। এই ইংরেজ যুবকের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদের টেলিগ্রাম পাওয়ার পর স্বামীজী বলেছিলেন, ''বুঝলাম পুত্রশোক কী ভয়ংকর!'' সন্তানসম প্রিয় গুডউইনের বিয়োগযন্ত্রণায় স্বামীজী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের মতোই করুণস্বরে আক্ষেপ করেছিলেন, ''আহা! গুড্‌উইন যদি বেঁচে থাকত, কত কি করতে পারতো!''[২৮] এই মৃত্যুর পর শোকোদ্বেল স্বামীজী অনেকদিন তাঁর কাজ বন্ধ রেখেছিলেন।

জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে একবার স্বামীজী একজনের চাকরির জন্য একটি সুপারিশপত্র লিখে দেন। পত্রটির ছত্রে ছত্রে চাকরিপ্রার্থীর প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা ও বিশ্বাস ফুটে উঠেছে, যা তাঁর উদার হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক : ''এই পত্রের বাহক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু। সে কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।... সে খুব সৎ ও বুদ্ধিমান্ ছেলে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার-গ্রাজুয়েট।... আমি আপনার স্বভাবসুলভ সহৃদয়তার সহিত পরিচিত আছি; তাই মনে হয় যে, এ যুবকটির জন্য কিছু করতে অনুরোধ করে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি না।... আপনি দেখতে পাবেন যে, সে সৎ ও পরিশ্রমী। কোন মানুষের প্রতি একটু দয়া দেখালে তার জীবন সুখময় হয়ে উঠতে পারে, এ বালক সেই দয়ার উপযুক্ত পাত্র; আপনি মহৎ ও দয়ালু, আপনাকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি না।''[২৯]

দেহত্যাগের দিন স্বামীজী বেলুড় বাজার পর্যন্ত বেড়াতে যান। ফিরে আমগাছের নিচে বেঞ্চে বসে অন্যদের সঙ্গে চা পান করেন। তারপর তিনি নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য দরজা খুলে ওপরের সিঁড়িতে পা দিলেন। সেবক বোধানন্দ তাঁর পিছনেই ছিলেন। স্বামীজী হঠাৎ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বোধানন্দজী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ''আমি একতলার সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন জুলাই

মাস। ভারতে প্রচুর মশা এবং তা এমন মারাত্মক যে, ওর কামড়ে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। মশারি ছাড়া রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সাধুদের অনেকেরই মশারি ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে মশা ঢুকলে তাদের আর বের করতে পারা যায় না। আমার প্রতি তাঁর শেষ আদেশ ছিল—'দেখিস, সাধুরা যেন সবাই নতুন মশারি পায়।' "[৩০] যে-মানুষটি আর ঘণ্টা দুয়েক পর শরীর ছেড়ে দেবেন, তিনি মশারির চিন্তা করছেন। কারণ ছেঁড়া মশারি দিয়ে মশা ঢুকে কামড়ালে সাধুদের ম্যালেরিয়া হতে পারে। ভাবা যায়! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর হৃদয় পরকল্যাণচিন্তায় মগ্ন—প্রকৃতই মায়ের মতো।

স্বামীজীকে এখনও আমরা চিনতে পারিনি। তাঁকে চেনা কি সহজ? কিন্তু তাঁকে চিনতে, জানতে, বুঝতে না পারলে ক্ষতি আমাদেরই। তিনি বলেছিলেন, "Well, what I am is written on my brow. If you can read it, you are blessed. If you cannot, the loss is yours, not mine."[৩১] ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৬৯
২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন তথ্য নতুন আলো*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃঃ ৩৪৬
৩। তদেব, পৃঃ ৩৪৭
৪। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহিগণ, ভাষান্তর : স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার, *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, পৃঃ ১৭১
৫। দ্রঃ স্বামী চেতনানন্দ, *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ৩৪৩
৬। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ৩০৯
৭। তদেব, পৃঃ ৩২৬
৮। দ্রঃ *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৮
৯। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩১৪
১০। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, ২০১৪, পৃঃ ২৬৭
১১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৩২
১২। *উদ্বোধন*, ১১৬ বর্ষ, ২০১৪, পৃঃ ৭৭৭
১৩। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ১৬
১৪। তদেব
১৫। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩১৪
১৬। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ২২৭
১৭। তদেব, ২২৮-২৯
১৮। তদেব, পৃঃ ৩২৬
১৯। দ্রঃ *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ২, (২০০১), পৃঃ ৫০-৫১
২০। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৩৩৪
২১। দ্রঃ সম্পাদনা স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭, পৃঃ ২৮০
২২। দ্রঃ সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *মহিমা তব উদ্ভাসিত*, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, পৃঃ ১৬৩-১৬৪
২৩। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৪৬
২৪। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ২৬৬
২৫। *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৩২৬-৩২৭
২৬। নিবোধত, সংখ্যা ৩, ২০১৫
২৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন, খণ্ড ৬, মার্চ ২০১০, পৃঃ ২৫১
২৮। *স্বামীজীর পদপ্রান্তে*, পৃঃ ২৪২
২৯। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, ২০১০, পৃঃ ২৬৬
৩০। *বহুরূপে বিবেকানন্দ*, পৃঃ ২২৫
৩১। *Prabuddha Bharata*, March 2007, p. 38